পাবার জন্য বাংলা ও উত্তর ভারতে শিক্ষিত মুসলমানেরা একজোট হয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স-এর অধিবেশন বসে। তখন থেকেই মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের ভাবনা জোরদার হয়। ফলে ঐ অধিবেশনেই মুসলমানদের জন্য অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ সংগঠন তৈরি হয়। ঐ সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের স্বার্থ ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি নজর রাখা। পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকার উদ্দেশ্য লিগের ছিল।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের সঙ্গেই লিগের কাজকর্ম চলতে থাকে। পরে অবশ্য সংগঠনদুটি আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন তাঁরা লিগ তৈরির বিরোধিতা করে ছিলেন। কিন্তু সেই বিরোধিতায় বিশেষ কাজ হয়নি। বরং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লিগের প্রসার ঘটে।

প্রথম দিকের মুসলমান নেতৃবৃন্দ। ছবিটির বাঁ-দিক থেকে রয়েছেন নবাব মহসিন উল মুলক, স্যর সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ মাহমুদ। সৈয়দ মাহমুদ মুসলমানদের মধ্যে প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এবার মুদ্রার বিপরীত দিকটিকে দেখা যাক। সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ যে পরস্পর-বিরোধী সেই ভাবনা তৈরি হওয়ার পিছনে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। যেমন, বাংলায় হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে অনেকসময়ই নেতিবাচক ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব দেখা যেত। এমনকি বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ সম্পর্কেও বিদ্বেষ প্রকাশ পেত হিন্দু ভদ্রলোকদের লেখাপত্রে। এসবের উপর স্বদেশি নেতৃত্ব তাঁদের হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক-কেন্দ্রিক রাজনীতির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বিভাজন আরও

প্রকট করে তোলেন। ফলে স্বদেশি আন্দোলনকে ঘিরেও বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঘোরতর হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী নেতারা বলতে থাকেন হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের বেশি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ফলে বাঙালি পরিচয়ের বদলে হিন্দু ও মুসলমান পরিচয় বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। তার উপর বাংলার গরিব কৃষকদের বিদেশি কাপড় বয়কট করার জন্য জোর করা হয়। কাজেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন একসময় হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়।

জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক পর্বে স্থির করেছিল যে তারা এমন কোনো প্রস্তাব নেবে না, যা

মুসলমান-স্বার্থ-বিরোধী। বহু মুসলমান কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্যায়ে যোগদান করেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি হিন্দু পুনরুজ্জীবনমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক চরমপন্থার জন্ম দেয়। এই উদ্যোগে হিন্দু ধর্মের কল্পকাহিনি এবং প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ভারতীয় জাতিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজের সংস্কারমুখী ধারা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ঐ পুনর্জাগরণের আন্দোলন। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ ও অতিরঞ্জিত কল্পনা। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীরা ভারত ও হিন্দুকে সমার্থক বলে প্রচার করতে থাকেন। বলা হতে থাকে যে, মুসলমান

শাসনের কারণে সেই সভ্যতার অধঃপতন ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে সে সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। পুনর্জাগরণবাদীরা অবশ্য হিন্দু সংস্কারবাদীদের পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী মনোভাবকে সমর্থন করেননি। ফলে তাঁদের কাছে ইংরেজ শাসন ও উদারপন্থী সংস্কারকরা জাতীয়তাবাদী হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রধানত উঁচুজাতির সংস্কারকদের ব্রাহ্মণ্য মতানুসারী ছিল। অধিকাংশ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় জাতিকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দুদের বলে চিহ্নিত করতে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তিলকের শিবাজি ও গণপতি উৎসব, অরবিন্দের দেশকে মাতৃবন্দনা ও

জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসাবে দেখা, গীতায় হাত রেখে বিপ্লবী শপথ নেওয়া প্রভৃতির কথা বলা যায়।

এসবের ফলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে চরমপন্থী রাজনীতির আবেদন কমে এসেছিল। এর অর্থ এই নয় যে হিন্দু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সবাই সচেতনভাবে মুসলমানদের দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। বরং অনেকেই দুটি সম্প্রদায়ের মিলনে দেশের অনগ্রসরতা দুর করা যাবে বলে ভাবতেন। অন্যদিকে শিক্ষিত মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু ধর্মীয় ঝোঁকের ফলে আন্দোলন থেকে দূরে সরতে শুরু করেন। নিজেদের সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ঐ মুসলমানদের

অনেকেই ক্রমে রক্ষণশীল রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েন। তার ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও উলেমার ঘনিষ্ট সহযোগিতায় মুসলমানদের নতুন সংগঠন তৈরি হয়। পাশাপাশি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা আরও জোরদার হতে থাকে। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার বদলে বিরোধিতার ভিত্তি পাকাপোক্ত হতে থাকে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পথে

বিশ শতকের তরুণ মুসলমান নেতৃত্ব আগাগোড়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। তবে বিংশ শতকের গোড়ায় বেশ কিছু সমস্যা তাঁদের আন্দোলনের

প্রকৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ভারতীয় মুসলমানেরা বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জানালেও তুরস্কের বিষয়টি ঘিরে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয়। তুরস্কের সুলতানকে 'খলিফা' বা মুসলিম জগতের ধর্মগুরু মনে করা হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে সুলতানের ক্ষমতা কমে যায়। তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অনেকটাই ব্রিটিশরা দখল করে। ঐ ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানেরা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা ব্রিটিশ-নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলি খলিফাকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সেই দাবি ক্রমশ ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ে তোলা ফটোগ্রাফ। ছবিটিতে বাঁ-দিক থেকে প্রথম জন শওকত আলি এবং তৃতীয় জন মহম্মদ আলি।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের নেতারা দিল্লিতে এক বৈঠকে মিলিত হন। খলিফা সংক্রান্ত মুসলিম লিগের দাবিকে জোরদার করার ডাক দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে গান্ধিজি কংগ্রেসের এবং মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, ওয়াহাজিব হাসান প্রমুখরা লিগের নেতৃত্বে আসেন। হিন্দু- মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী গান্ধি মুসলিম নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে গান্ধি খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ঐ বছরেই মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারবিধিতে হিন্দু ও

মুসলমানের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করলে সাংবিধানিক রাজনীতিতে নেতাদের বিশ্বাস টলে যায়। ফলে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন তুরস্কের পরাজয়ে ইসলাম বিপন্ন— এই আওয়াজ তুলে গণসমর্থন তৈরি করার চেষ্টা করে। এইসব ঘটনার ফলে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটে। নরমপন্থীদের তুলনায় উলেমা ও তাদের প্রভাবাধীন আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্থান ঘটে। গান্ধিও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে কংগ্রেসের ভিত্তি প্রসারিত করার জন্য খিলাফৎ সমস্যাকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম দাবি রূপে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি গান্ধির প্রস্তাবকে সমর্থন করে।

গান্ধি ও খিলাফতিরা একযোগে ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার কর্মসূচি প্রচার করতে থাকেন।

কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। পাশাপাশি খিলাফৎ আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে। খিলাফতি নেতারা গান্ধির অহিংসা- নীতিকে ততটা গ্রহণ করেননি। বরং গান্ধির সর্বজনগ্রাহ্যতাকে ব্যবহার করে জনগণের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করেছিলেন খিলাফতিরা। উলেমাদের উপস্থিতি ও ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার ইসলামীয় আন্দোলন ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে। ফলে খিলাফৎ আন্দোলনে হিংসার ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯২২-'২৩ খ্রিস্টাব্দে কয়েক জায়গায় দাঙ্গা

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মধ্যে ভাঙন ঘটায়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের খলিফা পদের অবসান ঘটে। তার ফলে খিলাফৎ আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যে ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে মুসলিম লিগের কর্মসূচিতে ছাপ ফেলেছিল। পাশাপাশি সমানভাবে বাড়তে থাকে উগ্র হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। এই সময় হিন্দু মহাসভার মতো উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির শক্তি বাড়তে থাকে। কংগ্রেসের সঙ্গে এই সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। মদনমোহন মালব্য

মদনমোহন মালব্য

প্রমুখ নেতাদের গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী কার্যকলাপ কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করায় মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমশ কংগ্রেসের থেকে আরও দূরে সরতে থাকে। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও মহম্মদ আলির মতো সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সমর্থক নেতারাও কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

উগ্রহিন্দু নেতাদের চাপে মোতিলাল নেহরুর মতো স্বরাজ্যপন্থী নেতারা হিন্দু- মুসলমান ঐক্যের উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ও স্বরাজ্য পন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও পঞ্জাবে কংগ্রেসের মধ্যে কোনো মুসলমান প্রার্থী ছিল না। ফলে শওকত আলির মতো সম্প্রীতিবাদী

নেতারাও কংগ্রেসের মধ্যে উগ্র হিন্দু মতামতের বাড়বাড়ন্তে হতাশ হয়ে পড়েন। এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলমানদের কম অংশগ্রহণের মধ্যে। জাতীয় আন্দোলন থেকে মুসলমানদের সরে থাকার ঐ প্রবণতাকেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে ব্যখ্যা করা হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, ১৯৩০-এর দশকেও রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে আলাদা আলাদা অবস্থান ছিল। ফলে 'মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা' বলে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানকে চিহ্নিত করা ইতিহাসগতভাবে ভুল।

১৯৩০-এর দশক দ্বি-জাতি তত্ত্বভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৩০

খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের সভাপতি মহম্মদ ইকবাল এবং পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরি রহমৎ আলি পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও কাশ্মীর নিয়ে মুসলমানদের আলাদা ভূ-খণ্ড গঠন করার প্রস্তাব দেন। রহমৎ আলি অস্পষ্টভাবে 'পাকিস্তান'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর ঘোষণায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথা বলা হয়। সেই ঘোষাণায় ব্রিটিশ সরকারের বিভাজন ও শাসন নীতিই প্রতিফলিত হয়েছিল। ঐ ঘোষণা মোতাবেক প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিধানমণ্ডলীতে কিছু আসন বরাদ্দ করা হয়। সেগুলিতে পৃথক পৃথক

সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্বাচন করার কথা ওঠে। কংগ্রেস এই ধরনের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী ছিল। কারণ তার ফলে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের বদলে সাম্প্রদায়িক ভাবনাকেই উৎসাহ দেওয়া হত। ভারতের সাধারণ স্বার্থের বদলে ভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থই বড়ো হয়ে উঠবে সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে কংগ্রেস।

টুকরো কথা

মহম্মদ ইকবাল

আধুনিক ভারতের একজন বিখ্যাত কবি মহম্মদ ইকবাল। তরুণ প্রজন্মের মুসলিম ছেলে- মেয়েদের ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবনাকে তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে গভীর ভাবে

আলোড়িত করেন। মানবতাবাদী ইকবাল মনে করতেন ভালো কাজ মানুষকে অমরত্ব ও শান্তি দেয়। আচার-অনুষ্ঠানের আধিক্য আর অন্যায় মেনে নেওয়া তাঁর কাছে ছিল পাপ কাজের নামান্তর। 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হমারা' ইত্যাদি বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কবিতা ইকবালের রচনা। যদিও শেষের দিকে তিনি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫ খ্রি:) মোতাবেক প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সাফল্য পেলেও, লিগ ততটা ভালো ফল করতে

পারেনি। মুসলমান জনসংখ্যা-প্রধান পঞ্জাব, বাংলা, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধ প্রভৃতি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা তৈরি হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। জিন্নাহ্‌ও সেই বছরে প্রথম দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রসঙ্গ সমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন। যদিও আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তখনও ওঠেনি। বরং আইনসভায় হিন্দু-মুসলমান সমতার দাবি গুরুত্ব পেয়েছিল। জিন্নাহ্‌র বক্তব্য ছিল ভবিষ্যতে সাংবিধানিক স্তরে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে মুসলমান জাতির মতামতকে অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে না।

টুকরো কথা

পাকিস্তান প্রস্তাব

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সভাপতিত্ব করেন। ঐ অধিবেশনে মুসলমানদের পৃথক জাতি হিসেবে আলাদা একটি স্বশাসিত রাষ্ট্রের দাবি উঠে আসে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরি রহমৎ আলি ১৯৩৩-'৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'পাকিস্তান' নামক একটি রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। যদিও লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক যে রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি ছিল তাতে 'পাকিস্তান'

নামের উল্লেখ ছিল না। এই প্রস্তাবটির খসড়া তৈরিতে সিকন্দার হায়াৎ খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফজলুল হক সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লিগ কর্তৃক গৃহীত মুসলমানদের জন্য পৃথক স্বশাসিত রাষ্ট্রের এই প্রস্তাবই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তোলা একটি ফটোগ্রাফ। ছবিটির বাঁ-দিকে রয়েছেন চৌধুরি রহমত আলি। মধ্যের জন মহম্মদ ইকবাল। ডানদিকের জন খাজা আব্দুল রহিম।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অগস্ট ঘোষণায় লর্ড লিনলিথগো প্রথম মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে কোন সমঝোতা হলে মুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলি লিগ ও কংগ্রেস উভয়েই মানতে অস্বীকার করে। সেই বছরেই ৮ অগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা হয়। লিগ সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। যখন প্রায় সব প্রধান কংগ্রেসি নেতাই জেলে

নিজে করো

তোমার ক্লাসে দুটি দল তৈরি করে ভারতবিভাজন অনিবার্য ছিল কি না, তা নিয়ে বিতর্কসভা আয়োজন করো।

বন্দি তখন পাকিস্তানের ধারণাটিকে ব্যাপক প্রচার করা হয়। এ কথা প্রকাশ্যে বলা হতে লাগল যে লিগকে সমর্থন করার অর্থ ইসলামকে সমর্থন করা। বহু মুসলমান-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র পাকিস্তান গঠনের দাবিকে সমর্থন জানাতে লাগল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসি নেতা সি. রাজাগোপালাচারী জিন্নাহ্‌র কাছে একটি সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি না থাকায়, জিন্নাহ্‌ ঐ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিমলা অধিবেশনে লিগ নিজেকে সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে। কংগ্রেস সেই সময়েই ঐ দাবিতে আপত্তি জানায়। লর্ড ওয়াভেলের সভাপতিত্বে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে

লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সিমলায় বৈঠক হয়। সেখানে সমতার দাবিতে জিন্নাহ্ অনড় থাকায় সেই বৈঠকও ভেস্তে যায়। মুসলিম জনগণের বিভিন্ন অংশের মানুষদের কাছ থেকে আলাদা হবার প্রচারে সাড়া পাওয়া যেতে থাকে। বিশেষ করে পেশাদার ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের কাছে পাকিস্তানের অর্থ ছিল হিন্দুদের তরফ থেকে প্রতিযোগিতার অবসান। এর সঙ্গে পির ও উলেমাও পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন ও ধর্মীয় বৈধতা দেয়।

তবে মনে রাখা দরকার মুসলিম লিগ মোটেই ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত ধরনের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করত না। বাংলায় এ. কে. ফজলুল হক-এর কৃষক প্রজা পার্টি নীচু

এ. কে. ফজলুল হক

জাতির হিন্দু ও মুসলমান উভয় কৃষকদের স্বার্থের পক্ষেই সওয়াল করত। এমনকি মুসলিম ভোট নিয়ে লিগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির লড়াইও চলেছিল। বস্তুত, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের বাইরে অধিকাংশ অঞ্চলেই লিগের বিশেষ প্রভাব ছিল না। বাংলায় ফজলুল হক-এর কৃষক প্রজা পার্টি বা পঞ্জাবে স্যর সিকন্দর হায়াৎ খান-এর ইউনিয়নিস্ট পার্টি আলাদা রাষ্ট্রের দাবিকে জোরদার করেনি। তবে ক্রমশ মুসলমান সমাজে এই পার্টিগুলির ভিত্তি দুর্বল হতে থাকলে, সেই শূন্যতা ভরাট

করে মুসলিম লিগ। বাংলা ও পঞ্জাব উভয় প্রদেশের কৃষকদের মধ্যে মুসলিম লিগের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। অবশ্য কংগ্রেস বারবার সেই সত্যটা

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও মহাত্মা গান্ধি। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তোলা একটি ফটোগ্রাফ।

অস্বীকার করতে চেয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বাংলা, সিন্ধু প্রদেশ ও পঞ্জাব বাদে প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু এই ফলাফল লিগের মধ্যে আশঙ্কার জন্ম দেয়। ভারতের রাজনীতির একমাত্র প্রতিনিধি কংগ্রেস— এরকম প্রচার হতে

পারে বলে ভেবে নেয় মুসলিম লিগ। ফলে লিগের দাবিতে বিচ্ছিন্নতার মাত্রা বৃদ্ধি হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিলেও, মুসলিম লিগ তাতে অসম্মত হয়। ১৬ আগস্ট থেকে পাকিস্তানের জন্য গণআন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ দিনে কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যই পূর্ববঙ্গ, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায় মারাত্মক সংঘর্ষ শুরু হয়। সেপ্টেম্বর মাসে নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশাসনে অবস্থান বজায় রাখতে লিগ যোগ দিতে সম্মত হয় এবং পাঁচজন

প্রতিনিধি পাঠায়। ভারতীয় গণপরিষদ ডিসেম্বর মাসে তার প্রথম সভা করে। কংগ্রেস পরিষদকে সার্বভৌম মনে করলেও, লিগ সেই মত মানতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতেই থাকে। ব্রিটিশ সরকার ঐসব দাঙ্গা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। এই দুঃসময় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কংগ্রেস ও লিগ-নেতৃত্ব ভারত বিভাজনকে একমাত্র উপায় মনে করে। ফলে ভি. পি. মেনন ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন-এর পরিকল্পিত খসড়াকে ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন করে। ঐ খসড়া কংগ্রেস ও লিগের কাছে পেশ করা হয়। দুটি

রাজনৈতিক দলই সেই প্রস্তাব মেনে নেয়। ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭ অনুমোদন করে। সেই মোতাবেক ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এবং ১৫ অগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

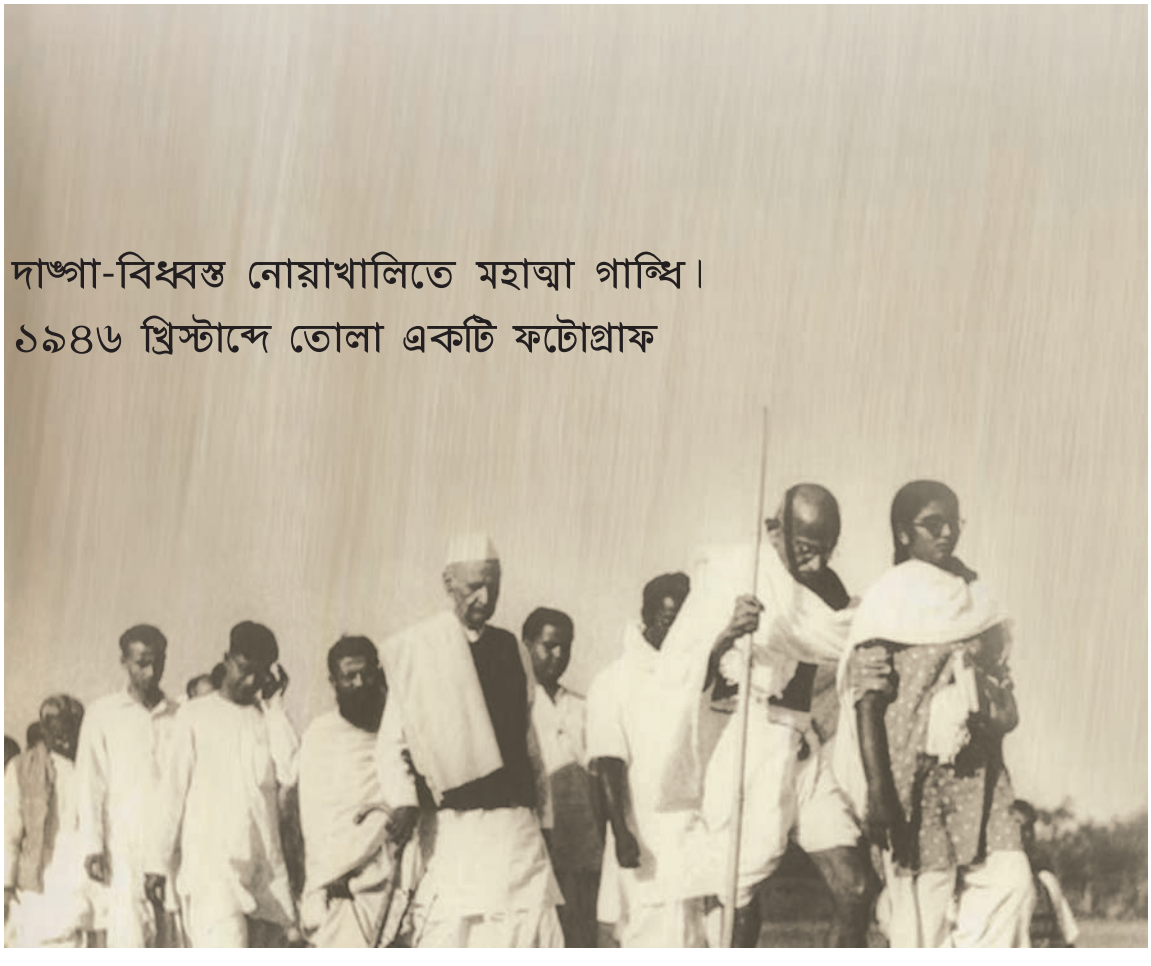

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধি।
১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তোলা একটি ফটোগ্রাফ

টুকরো কথা
র‍্যাডক্লিফ লাইন

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অনেক টানাপোড়েনের পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন-এর ভারত-বিভাগের পরিকল্পনা কংগ্রেস ও লিগ মেনে নেয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা ও পঞ্জাবকে ভাগ করার জন্য দুটি পৃথক সীমান্ত কমিশন গঠন করা হয়। দুটি কমিশনেই লিগ ও কংগ্রেস থেকে দু-জন করে সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন বিশিষ্ট ব্রিটিশ আইনজীবী স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ দুটি কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১২ জুলাই কার্যভার গ্রহণ করেন। অত্যন্ত দ্রুততার

সঙ্গে র‍্যাডক্লিফ ভারতের বিভাজন মানচিত্র (র‍্যাডক্লিফ লাইন) তৈরি করেন। ঐ বিভাজন মানচিত্র ভারতের বহু মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। র‍্যাডক্লিফ লাইন অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তৈরি করা হয়। র‍্যাডক্লিফের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। অনেক এলাকার মানচিত্র র‍্যাডক্লিফ নির্ধারণ করেছিলেন, যা তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি। সর্বোপরি, বাংলা ও পঞ্জাব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হয়নি। সমস্ত সাধরণ মানুষ আদৌ দেশভাগ চেয়েছিল কি না--- সেই মতামতের কোনো মূল্য কারোর কাছেই ছিল না। ব্রিটিশ

সরকারের কাছেও জরুরি ছিল কংগ্রেস ও লিগ দেশভাগে সম্মত হয়েছে। ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পাশাপাশি বীভৎস দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু জীবন স্বাধীনতাকে কালিমালিপ্ত করেছিল।

দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মানুষের যাত্রা। মূল ফটোগ্রাফটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট-এর তোলা।

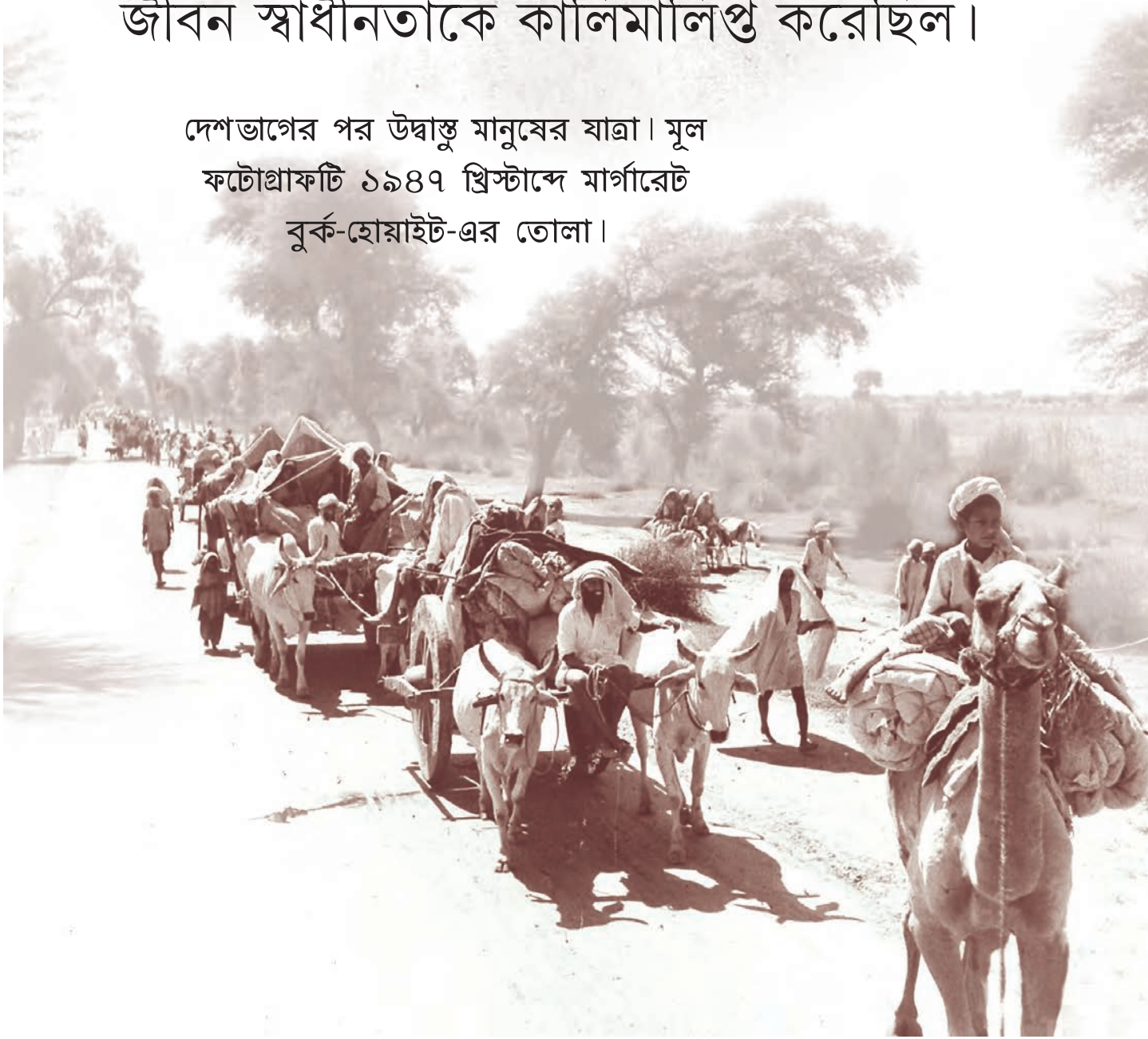

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট
মধ্যরাতে ভারত
কাশ্মীর
উত্তর
পঞ্জাবের রাজ্য
রামপুর
রাজপুতানা
গোয়ালিয়র
বেনারস
পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য
মণিপুর
পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য
দিউ
দমন
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
হায়দরাবাদ
কোলহাপুর
গোয়া
ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল
দেশীয় রাজ্যসমূহ
পোর্তুগিজ অধিকৃত অঞ্চল
ত্রিবাঙ্কুর
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) ঔপনিবেশিক ভারতে সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসির বদলে ইংরেজিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় _____ (১৮৪৭/১৮৩৭/১৮৫০) খ্রিস্টাব্দে।

খ) ভারতের মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের অভিযান প্রথম শুরু করেছিলেন _____ (মহম্মদ আলি জিন্নাহ্/ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ/স্যর সৈয়দ আহমদ খান)।

গ) কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ছিলেন _____ (এ. কে. ফজলুল হক / মহম্মদ আলি জিন্নাহ্/ জওহরলাল নেহরু)।

ঘ) স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ————————(১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট/ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট /১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি)।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) উনিশ শতকে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল।

খ) হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল।

গ) মহাত্মা গান্ধি খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি।

ঘ) পাকিস্তান প্রস্তাব তোলা হয়েছিল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :

ক) আলিগড় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

খ) স্বদেশি আন্দোলন বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

গ) ভারতীয় মুসলমানেরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেছিলেন কেন?

ঘ) ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০টি শব্দ) :

ক) স্যর সৈয়দ আহমদ খান কীভাবে মুসলমান সমাজকে আধুনিকীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করো।

খ) কীভাবে উনিশ শতকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল? সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরিতে ঐসব আন্দোলনগুলির ভূমিকা কী ছিল?

গ) অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরে কীভাবে মুসলমান নেতাদের অনেকের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল?

ঘ) ১৯৪০-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কীভাবে ভারত-ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল? তোমার কী মনে হয় ভারত বিভাগ সত্যিই অপরিহার্য ছিল? তোমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাও।

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

মনে করো ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তুমি ভারত-ভাগের কথা জানতে পারলে। তোমাকে তোমার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা নিজের ভাষায় লেখো।

৯ ভারতীয় সংবিধান : গণতন্ত্রের কাঠামো ও জনগণের অধিকার

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট। অনেক ক্ষয়ক্ষতি, দেশভাগ শেষে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হলো। পলাশির যুদ্ধ থেকে ধরলে ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হলো ভারতবর্ষ। ফলে একদিকে ছিল মুক্তির আনন্দ। কিন্তু অন্যদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সামনে তখন অনেক সমস্যা। সেই সবের মধ্যেই

স্বাধীন ভারতের সংসদ ভবন, নয়া দিল্লি।

কাজ করে চলেছিল সংবিধান সভা। বানানো হচ্ছিল স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার শেষে তৈরি হলো ভারতের সংবিধান। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গ্রহণ করা হলো সংবিধানটি। পরের বছরে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতে কার্যকর হলো সংবিধান।

সংবিধান বলতে বোঝায় কতকগুলি আইনের সমষ্টি। সেই আইন মোতাবেক কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান তাই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধানের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের নিরিখে সংবিধান হলো সেইসব আইনকানুন, যার দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, নাগরিকদের

অধিকার এবং সরকার-নাগরিকদের সম্পর্ক পরিচালিত হয়। সংবিধান একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল তখন ব্রিটিশ সরকারের আইন মোতাবেক ভারত শাসন করা হতো। সেখানে ভারতীয়দের চাওয়া-পাওয়ার কোনো প্রতিফলন ঘটত না। তাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতীয়দের জন্য একটি সংবিধান রচনার দাবি তুলতে থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবাসীর কিছু কিছু দাবি মেনে নিলেও প্রশাসনের মূল নিয়ন্ত্রণ তারা নিজেদের হাতেই রেখেছিল।

তবে ক্রমাগত আন্দোলনের চাপে ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও সংবিধানের দাবিকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তাই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি সংবিধান সভা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ সভার কাজ হবে ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গণপরিষদ গঠিত হয়। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয়। বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সাতজনের খসড়া কমিটি সংবিধান রচনার কাজটি করেছিল।

টুকরো কথা

সাধারণতন্ত্র দিবস

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতকে সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। তাই ঐ দিনটিতে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়। ভারতবর্ষের সংবিধান বিশ্বের সবথেকে বড়ো সংবিধান। বিভিন্ন দেশের সংবিধানের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি ভারতের সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের থেকে মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা, আয়ারল্যান্ডের থেকে নির্দেশমূলকনীতি ইত্যাদি।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

ভারতীয় সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। সংবিধানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনাকে 'সংবিধানের বিবেক' বা 'সংবিধানের আত্মা' বলা হয়। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র' বলা হয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই আদর্শদুটি যুক্ত করে ভারতকে 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' বলা হয়েছে। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটির গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

সার্বভৌম বলতে বোঝায় ভারতরাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চরম বা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। বিদেশি কোন রাষ্ট্র বা সংস্থার আদেশ, নির্দেশ বা অনুরোধ ভারত মানতে বাধ্য নয়।

সমাজতন্ত্র বলতে সাধারণত উৎপাদনের উপকরণগুলির ওপর রাষ্ট্র তথা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদিত সম্পদের সমান ভাগকে বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে অন্য অর্থে। সেখানে মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানা -নির্ভর অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে,

ধর্মনিরপেক্ষ বলতে বোঝানো হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। বিশেষ কোনো ধর্মের হয়ে কথা বলা বা বিরোধিতা করা কোনটাই রাষ্ট্র করবে না। প্রত্যেক নাগরিক তাঁর নিজের বিশ্বাস মতো ধর্মাচরণ করতে পারবেন।

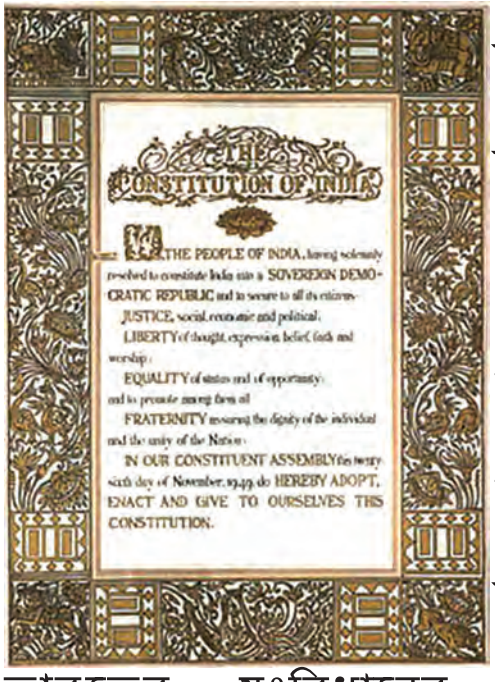

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা। মূল পৃষ্ঠাটির অলংকরণ করেছিলেন নন্দলাল বসু।

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে সামাজিক -অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্র বলতে মূলত

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভোট দিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির আইনসভায় এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

সাধারণতন্ত্র বলতে বোঝায় ভারতের শাসনব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক কোনো রাজা বা রানির স্থান নেই। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তিনিও ভারতের জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস ও রক্ষক ভারতীয় জনগণ। সেজন্য ভারতীয় সংবিধানে সাধারণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীপরিষদ নিয়ে কেন্দ্রের শাসনবিভাগ গঠিত হয়। আইন এবং তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্রের শাসনবিভাগের প্রধান। যদিও বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদই রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

রাষ্ট্রপতি

ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। রাষ্ট্রপতি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ পদ্ধতিকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। একই ব্যক্তি একাধিক বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে

পারেন। রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হতে গেলে ঐ ব্যক্তিকে কমপক্ষে ৩৫বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক এবং লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। সরকারি কোনো লাভজনক পদে তিনি নিযুক্ত থাকতে পারবেন না।

মনে রেখো

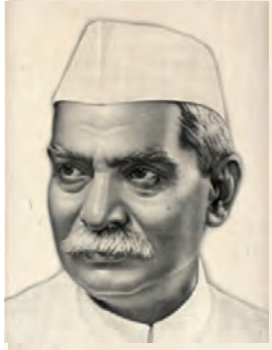

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।

ইংল্যান্ডের রানির মতো ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের শাসন বিভাগের নামমাত্র প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ও ভূমিকার কোনো মিল নেই। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।

উপরাষ্ট্রপতি

পদমর্যাদার দিক থেকে রাষ্ট্রপতির পরেই উপরাষ্ট্রপতির স্থান। উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে গেলে কমপক্ষে ৩৫বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক এবং রাজ্যসভায় সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। উপরাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রপতির মতোই এক বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল সাধারণত পাঁচ বছর।

স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।

কেন্দ্রীয় আইনসভা

রাষ্ট্রপতি ও দুইকক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ গঠিত।

কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন রচনা, সংবিধান সংশোধন, করের হার নির্দিষ্ট করা—প্রভৃতি নানা কাজ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষকে বলা হয় রাজ্যসভা। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে অনধিক ২৫০জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হয়। রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে বিজ্ঞান চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ১২জন ভারতীয় নাগরিককে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে অন্তত ৩০ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। রাজ্যসভার সদস্যরা ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের দ্বারা লোকসভার প্রায় সকল সদস্য নির্বাচিত হন। কেবল রাষ্ট্রপতি দু-জন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন। সংবিধানে বর্তমান লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৫২ করা হয়েছে।

লোকসভার সদস্যপদে প্রার্থী হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। ঐ ব্যক্তি কেন্দ্র বা রাজ্য -সরকারের অধীনে চাকরিরত থাকতে পারবেন না। লোকসভার সদস্যরা সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ বা স্পিকার। অধ্যক্ষের অবর্তমানে উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি স্পিকার

সভার কাজ পরিচালনা করেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ উভয়েই লোকসভার সদস্যদের মধ্য থেকে এবং সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

প্রধানমন্ত্রী

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। তিনি হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান। রাষ্ট্রপতি দেশের সাংবিধানিক প্রধান হলেও, প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচালক।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

লোকসভা নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। কোনো দল বা জোট নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে, তখন রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করে লোকসভার সদস্যদের মধ্যে কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত ঐ ব্যক্তিকে কিছুদিনের মধ্যে লোকসভায় বেশিরভাগ সদস্যের সমর্থন অর্জন করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী একাধিক দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখতে পারেন। তাঁর পরামর্শ মতো রাষ্ট্রপতি অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

রাজ্যের আইনসভা

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে আইনসভা রয়েছে।

কোনো কোনো রাজ্যের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। আবার কোনো রাজ্যের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। যে সমস্ত রাজ্যের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট তার উচ্চকক্ষের নাম বিধানপরিষদ এবং নিম্নকক্ষের নাম বিধানসভা। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট, শুধু বিধানসভা নিয়ে গঠিত। রাজ্যপাল, বিধানসভা এবং বিধানপরিষদ অথবা কেবল রাজ্যপাল ও বিধানসভা নিয়ে রাজ্য আইনসভা গঠিত হয়।

রাজ্যপাল

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সবার উপরে রাজ্যপালের স্থান। যদিও তিনি নিয়মতান্ত্রিক বা নামমাত্র প্রধান। রাজ্যপাল কেন্দ্রীয়

সরকারের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তিনি রাজ্যের জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন না।

সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হতে হলে ঐ ব্যক্তিকে অন্তত ৩৫ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে চাকরি বা কোনো লাভজনক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

রাজ্যের রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত পদে ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন রাজ্যপাল।

রাজ্যে বিধানপরিষদ থাকলে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে রাজ্যপাল সেখানে নিয়োগ করেন।

বিধানসভা

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে বিধানপরিষদকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনসভায় কেবল বিধানসভা রয়েছে। বিধানসভার প্রায় সব সদস্য বা বিধায়কগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। কেবল কোনো কোনো বিধানসভায় একজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য রাজ্যপালের ইচ্ছানুযায়ী মনোনীত হতে পারেন। বিধানসভার সদস্যদের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ বছর।

মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রের মতো ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে সংসদীয় সরকার রয়েছে। সেই সরকারের প্রধান হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালকে সাহায্য করার ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য রাজ্যে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে। ঐ মন্ত্রীসভার প্রধান হবেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রীকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা তাঁদের কার্যাবলির জন্য বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে স্বায়ত্তশাসন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ জনগণ তাঁদের স্থানীয় অঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় সরাসরি অংশ নিতে পারেন। তাঁরা নিজেরাই গ্রাম ও শহরের শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করতে পারেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় মানুষজন প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে নাগরিক চেতনা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। তার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সফল হয়।

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গ্রামীণ ও পৌর দুটি ভাগে বিভক্ত। গ্রামীণ

স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নামে পরিচিত। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তিনটি স্তর রয়েছে। সবথেকে নীচের স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। তার উপরে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি। তারও উপরে রয়েছে জেলা পরিষদ।

গ্রাম পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বনিম্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কতকগুলি পরপর সংলগ্ন গ্রাম বা গ্রামের সমষ্টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা নির্ধারিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ভোটার হতে হবে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের চাকরিজীবী কোনো ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হতে পারেন না।

পঞ্চায়েতের সদস্যরা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে পঞ্চায়েত প্রধান ও আর একজনকে উপপ্রধান নির্বাচন করেন। বর্তমানে প্রধান এবং উপপ্রধান পদটি এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য এবং জনসংখ্যার অনুপাতে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকাল সাধারণত পাঁচ বছর তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার তার মেয়াদ ছয় মাস বাড়াতে পারে। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রতিমাসে অন্তত একবার

পঞ্চায়েতের সভা ডাকা বাধ্যতামূলক। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় সাধারণত সভাপতিত্ব করেন গ্রাম প্রধান।

পঞ্চায়েত সমিতি

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তর হলো পঞ্চায়েত সমিতি। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ব্লক তৈরি হয়। সেই ব্লকের নাম অনুসারে নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নামকরণ করা হয়। ব্লক উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং কোনো মহিলা সদস্য না থাকলে, সেক্ষেত্রে সরকার তাঁদের মধ্য থেকে সর্বাধিক দু-জন সদস্য নিয়োগ করতে পারেন।

পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীর সমান যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো পঞ্চায়েত সমিতির মেয়াদও ছয় মাস বাড়াতে পারে। পঞ্চায়েত আইনে প্রতি তিনমাস অন্তর সমিতির সভা ডাকার কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করেন। সমিতির সভায় সভাপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি ও সহসভাপতির পদটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতোই

এক-তৃতীয়াংশ মহিলা এবং জনসংখ্যার অনুপাতে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত।

জেলা পরিষদ

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে কলকাতা ও দার্জিলিং বাদে প্রত্যেকটি জেলায় জেলা পরিষদ রয়েছে। জেলা পরিষদে প্রার্থী হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তির গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীর সমতুল্য যোগ্যতা থাকা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবন, কলকাতা।

জেলা পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এর কার্যকাল কিছুটা সময় বাড়ানো যায়। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তিনমাসে অন্তত একবার অধিবেশন ডাকা বাধ্যতামূলক। জেলা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাধিপতি। সভাধিপতির অবর্তমানে সহসভাধিপতি সভার এবং অন্যান্য কাজ পরিচালনা করেন।

জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সভাধিপতি ও আর একজনকে সহসভাধিপতি নির্বাচন করেন। সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত। নিজপদে থাকাকালীন কোনো

লাভজনক সংস্থা, ব্যবসা ও পেশায় নিযুক্ত থাকতে পারেন না।

পৌরসভা

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ পৌরসভা। রাজ্য সরকার প্রতিটি পৌর অঞ্চলকে কতগুলি ওয়ার্ড-এ ভাগ করতে পারেন। সেই প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পৌরসভার সদস্যদের বলে কাউন্সিলর। কোনো ব্যক্তি ঐ এলাকার ভোটদাতা হলেই এলাকার কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বাকি যোগ্যতা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের যোগ্যতার মতোই। পৌর এলাকার

নির্বাচিত কাউন্সিলরদের নিয়ে তৈরি কাউন্সিলর পরিষদকেই পৌরসভা বলা হয়। ঐ পরিষদের কাজের মেয়াদ হলো পাঁচ বছর। কাউন্সিলর পরিষদ নিজেদের মধ্যে থেকেই একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচন করেন।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে একটি চার্ট বানাও। পাশাপাশি স্থানীয় অঞ্চল সমীক্ষা করো যে কীভাবে ঐ অঞ্চলের আরও উন্নতি করার যেতে পারে বলে অঞ্চলের বাসিন্দারা মনে করছেন।

সামাজিক উন্নয়নে সংবিধানের ভূমিকা

ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা আছে। তবুও নারী ও পুরুষকে সমাজে সমান চোখে দেখা হয় না। দৈনন্দিন জীবনে মেয়েরা পরিবারে ও সমাজে নানা অবহেলার শিকার হয়। জন্মানোর পর কন্যাসন্তানদের অবহেলা ও পীড়নের শিকার হতে হয়। বিয়ের সময় চলে পণ দেওয়া-নেওয়ার প্রথা। তাছাড়া নারী পাচারের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে চলে।

নারীদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া এইসব অমানবিক ঘটনা রুখতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নারীদের অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য বেশ কিছু আইনও বলবৎ করা হয়েছে। সেই আইনগুলি ভারতের সংবিধানের অন্তর্গত। পাশাপাশি নারীদের শিক্ষার প্রসারের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদেরও পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে নারীর সামাজিক ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ তৈরি হয়েছে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানগতভাবে বলা হয়েছে যে, জমি ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে।

টুকরো কথা

পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপনের উদ্যোগে ভারতে পৌরশাসন ব্যাবস্থা তৈরি হয়েছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় পৌরআইন তৈরি হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর সেই আইন মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গেও পৌরসভাগুলি পরিচালিত হতো। পরে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পৌরশাসন ব্যবস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ পৌরবিল তৈরি হয়েছিল। পরের বছর সেই বিলটি আইন হিসেবে কার্যকর হয়।